Vol. 57 | No. 3 | 2022

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০' : বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তার স্মারক

Volume	57
Issue	3
Year	2022
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. সোহানুজ্জামান
Published online	June 1, 2022
DOI	10.62328/sp.v57i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v57i3.8
Pages	১৪৩-১৬১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০' : বাঙালি জা[illegible]ারক

Check for updates

মো. সোহানুজ্জামান*

সারসংক্ষেপ: বাঙালি জাতীয়তাবাদ মূলত ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। বাংলা ভাষা এবং এর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত-সম্পৃক্ত নানা বিষয় নিয়ে নির্মিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশে সাংস্কৃতিকভাবে বিপুল অবদান রেখেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, এ বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা। এ প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-কাঠামো এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা-কাঠামোয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবয়সী বাংলা বিভাগ, এবং বাংলা বিভাগ আয়োজিত *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০* কীভাবে জাতীয়তাবাদী চিন্তায় সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রেখেছিল — সে সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যার সময়পর্ব স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ।

১.

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধানতম ভিত্তি বাংলা ভাষা। '... যে-জন্য এ জাতীয়তাবাদ ভারতীয় নয়, এবং ছিল না সে পাকিস্তানীও।' (সিরাজুল, ২০১৫: ৩) ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য যে 'সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' নির্মিত হয়েছিল, তার সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা। এছাড়া মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র (১৮৭৬-১৯৪৮) 'দ্বিজাতি-তত্ত্বের' ভিত্তিতে যে 'পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ' নির্মিত হয়েছিল — যে জাতীয়বাদের মৌলিক অনুঘটক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল 'সাম্প্রদায়িক চৈতন্য' — সে হিসেবে চৈতন্যগত দিক থেকেও ভিন্ন চৈতন্যের ধারক বাঙালি জাতীয়তাবাদ; মূলত চৈতন্যগত দিক থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।

এমনকি ইউরোপে রেনেসাঁর প্রভাবে, আধুনিক যুগে যে জাতীয়তাবাদের সূচনা ঘটেছিল, তার সাথেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের রয়েছে বিস্তর ফারাক, যে বিষয়টা অবশ্যই কেন্দ্র-প্রান্তগত এবং বৈশ্বিক রাজনীতির সাথেও বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। যদিও ইউরোপের জাতীয়তাবাদের পশ্চাতেও ল্যাটিন ভাষার একক ও সর্বগ্রাসী আধিপত্য থেকে নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষা নির্মাণের বিষয়টা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। অপরদিকে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা-প্রকল্পের সম্পূর্ণতায় বাংলা ভাষা রেখেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এমনকি ভাষা আন্দোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত না হলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ এবং

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এর পূর্ণাঙ্গ পরিণতি সম্ভব হতো কিনা — সে বিষয়ে একটা 'প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসা' রয়েই যায়।

বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গ কাঠামোপ্রাপ্তির পূর্বে একে আরো দুটো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তারপরই বর্তমান কাঠামো ও পরিস্থিতিতে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তাহলে এর পূর্বে, সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমাপ্তিতেই কেন বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র থাকতে পারল না? নির্মিত হলো না বাঙালি জাতীয়তাবাদ? আদতে বিষয়টা যে হতে পারেনি এর কারণ হলো, নির্দিষ্ট ধর্মীয় চৈতন্যের ব্যবহার এবং একটা নির্দিষ্ট শ্রেণি-স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার। কিন্তু সেই সাময়িক উন্মাদনা, পাকিস্তান নির্মাণের জন্য, সহজেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়সমূহের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক নানা অনুষঙ্গের বৈপরীত্য এক্ষেত্রে বড় অনুঘটক হিসেবে সক্রিয় ছিল। দ্বিজাতি-তত্ত্বের 'ফাঁকা বুলির' সত্যতা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বহুকথিত, আদতে তাত্ত্বিক-সূত্র মেলে না, নয়া-ঔপনিবেশিক[১] কর্মকাণ্ডেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়া হঠাৎ করেই, ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন থেকে মুক্ত হওয়া নতুন দেশের জন্য, ক্ষমতা-কাঠামোর জন্য, রাষ্ট্রযন্ত্র নির্মাণের পিছনে আরো নানা কার্যকারণ-সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

বিশেষ করে সহিংস-মনস্তত্ত্ব এবং স্বার্থভিত্তিক রাষ্ট্র-গঠনের জন্য নানা রকম কৌশল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট শ্রেণি। (ফানো, ২০১৭: ৩২) যেমন করে ভারত-ভাগের সময় ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল; কার্যত, বিষয়টা সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা শ্রেণিকে দলে টেনে আনার জন্য। এবং এভাবেই উপনিবেশিত অঞ্চলের বিভক্তি ঘটেছে। যদিও ভারতীয় উপমহাদেশ ভাগের পেছনে একটা নির্দিষ্ট 'এলিট শ্রেণি' সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। (জয়া, ২০১৯: ভূমিকাংশ) ভারত ভাগ হলো; সৃষ্টি হলো দুটি দেশের। এর মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র-নির্মাণে বড় ভূমিকা পালন করল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চিন্তা-কাঠামোর পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ কার্যকর ভূমিকা রাখে, তা আসলে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে ছিল না। কেবলই ধর্মীয় চৈতন্যের ওপর ভিত্তি করে এ রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ নির্মিত হয়েছিল। ফলে সাময়িক এবং ভিত্তিহীন উন্মাদনায় বুঁদ হয়ে যারা এ রাষ্ট্র নির্মাণ করেছিল, তারাও এর পরিণাম ভোগ করতে শুরু করেছিল শীঘ্রই। এ 'স্লোগানধর্মী' এবং 'সাময়িক ধর্মীয় চৈতন্যের' উন্মাদনায় নির্মিত জাতীয়তাবাদের যে গভীর সমস্যা, সে বিষয়ে রোমিলা থাপারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

> Nationalism had, and has, much to do with understanding one's society and finding one's identity as a member of that society. It cannot be reduced merely to waving flags and shouting slogans and penalizing people for not shouting slogans like 'Bharat Mata ki Jai'. This smacks of a lack of

> confidence among those making the demand for slogans. Nationalism requires a far greater commitment to attending to the needs of the nation rather than sloganeering, and that too with slogans focusing on territory or ones that have a limited acceptability. (Romila, 2016: 11)

রোমিলা থাপারের এই উক্তি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রোমিলা জাতীয়তাবাদী চিন্তার ফাঁকটা দেখাতে গিয়ে 'স্লোগান' ও 'পতাকা-নির্ভর' জাতীয়তাবাদের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। রোমিলা থাপারের মতে, জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার জন্য আরো বিশেষ কিছু প্রয়োজন — বিশেষ করে খাঁটি জাতীয়তাবাদ নির্মাণের বেলায় তা বিশেষভাবে দরকারি, তেমনি জাতীয়তাবাদের ক্ষণস্থায়িত্ব দূরীকরণেও এর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। বস্তুত একটি বিশেষ বোধ বা চেতনা, যার সাথে একটা গোষ্ঠী সংযুক্ত হয়, এবং তা লালন-পালনও করে তাদের দৈনন্দিন যাপিত জীবনের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে — আদতে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, জাতীয়তাবাদ নির্মাণের জন্য। কারণ এ চেতনা দ্বারা তাড়িত হয়েই একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে, এবং তাদের পৃথক রাষ্ট্রের জন্য জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। তাহলে কেউ কেউ কি এ ঐক্যবদ্ধতার বিপরীতে অবস্থান করে না? যে গোষ্ঠী নির্দিষ্ট চেতনা বা বোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে জাতীয় মুক্তি এবং নতুন ভূখণ্ডের জন্য লড়াই করছে, ওই ভূখণ্ডে? অবশ্যই এ ভূখণ্ডের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বাইরে কিছু ব্যক্তি বিরোধিতা করবে। তবে সামষ্টিকের হিসাবে তারা আবার সামান্যই; এবং শেষমেশ পরাজিত হতে বাধ্য।

২.

আলোচনা করা দরকার জাতীয়তাবাদের ভালো ও মন্দ দিক নিয়েও। জাতীয়তাবাদে দুটো দিকই বিদ্যমান: এর ভালো দিক যেমন আছে, তেমনি আছে মন্দ দিকও। সভ্যতার বিবর্তনের ধারাবাহিক সময়ে পৃথিবীর মানুষ এ দুটো দিকেরই সাক্ষী হয়েছে, নানা ঘটনার মাধ্যমে। ইউরোপ, আমেরিকা, ইসরাইল দ্বারা এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে নানা সময়ে; এখনো তা হচ্ছে। (সিরাজুল, অবতরণিকা-অংশ, ২০১৫: ১) সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত-শোষিত হয়েছে সমগ্র বিশ্বের মানুষ। সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যারা, তারাও রেনেসাঁস ও আধুনিক চিন্তা-প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ করেছে, জাতীয়তাবাদ নির্মিত হয়েছে। সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জাতীয়তাবাদ কোনোভাবেই মঙ্গলময় ছিল না, বিশ্বের জন্য। কিন্তু এদের রুখে দিতে গিয়ে, যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হলো; তা এদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধেই আন্দোলন হলো। এখানেই আবার সার্থক জাতীয়তাবাদ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদ এ ইতিবাচক বোধ ও চিন্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্মিত হয়েছিল। দীর্ঘ সময় ইংরেজ-শাসনের অধীন থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধীনে এসে

বাঙালি মৌলিক অধিকার-প্রাপ্তির যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা শেষাবধি বাস্তবে রূপলাভ করেনি। বরঞ্চ নতুন রাষ্ট্রে পূর্ব-বাংলার মানুষ আরো বেশি শোষণ-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। যে আন্দোলন পূর্ব-বাংলার জনগণ করেছিল নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়; কিন্তু পরবর্তীকালে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরিবর্তে আরো নানা দুর্ভোগ নেমে এসেছিল পূর্ব-বাংলার জনগণের ওপর।

স্বাভাবিকভাবেই কাঁচামালের যোগানদাতা (hinterland) হিসেবেই ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব-বাংলা, ইংরেজ আমলে। প্রশাসনিক ক্ষমতা-কাঠামোয় স্থান-প্রাপ্তির ইতিহাসে পূর্ব-বাংলার মানুষের অবস্থান ছিল একেবারেই নগণ্য। এছাড়া শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও একটা বিচ্যুতি ঘটে গিয়েছিল পূর্ব-বাংলার মানুষের বেলায়, সে সময়কার কেন্দ্র কলকাতা থেকে। ফলে 'প্রতিষ্ঠা' বলতে 'আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায়' যা বলে, তার সংস্পর্শে আসতে পারেনি পূর্ব-বাংলার জনগণ। একটা কৃষিভিত্তিক সমাজের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে পূর্ব-বাংলার জনগণ। অর্থাৎ 'কলকাতার বাইরে শত-শত বছরের যে-আবহমান বাংলা...', (আবদুল মান্নান, ১৯৯৭: ২৫) তাই বড় ভূমিকা পালন করেছে এ ক্ষেত্রে। কিন্তু এর বাইরে, কলকাতায় গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে 'প্রতিষ্ঠা' পায়নি, ব্যাপারটা এমন নয়। অনেকেই তা পেয়েছে, তবে তার পরিমাণ নিতান্তই কম। আর এ প্রক্রিয়াটিও একটা 'ছিন্নমূল' (rootless) ও বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় রূপলাভ করেছে। সে ছিন্নমূল ও বিচ্ছিন্ন চিন্তা চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের কবিতার মধ্যেও স্পষ্ট হয়। একটা গভীর বেদনাবোধ, যা 'প্রতিষ্ঠা'-প্রাপ্তির হিসেবে তো বটেই, অবদমিতভাবেই ছিল দীর্ঘদিন। এ অবদমিত মানসিক বেদনাকে বাস্তবতায় এনে একটা রফা করার জন্যই হয়তো নতুন ভূখণ্ডের চিন্তায় মশগুল হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পূর্ব-বাংলার মানুষ। কিন্তু এই যে স্বপ্ন, এই যে আকাঙ্ক্ষা, এর কোনো বাস্তব-ভূমি ছিল না। একটা কাল্পনিক (utopian)[২] ভূখণ্ড যে তারা নির্মাণ করতে যাচ্ছে, সে চেতনা বোধহয় তারা সে সময় হারিয়েছিল। বস্তুত উন্মাদনায় এমন নানা উদ্ভট বিষয়ের সৃষ্টি হয়।

সে বোধ ফিরে এসেছিল পূর্ব-বাংলায়, পূর্ব-বাংলার 'বাঙালদের'[৩] মধ্যে। তারা বুঝতে পেরেছিল এতদিনে কী ভুল তারা করে ফেলেছে! ধর্মের কথা বলে বাদবাকি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয়নি; এমনকি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোয় তাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারটাও নিশ্চিত করা হয়নি। আর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিষয়টি তো সংঘটিত হয়েছিলই। পূরণ হয়নি কোনো কিছুই। আবার মধ্যবিত্তের অন্যতম সহায়-সম্পদ হিসেবে বিবেচিত ভাষা কেড়ে নেওয়ারও এক কুমতলব প্রকাশ পেল পাকিস্তান রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার পরপরই, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত স্বয়ং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র মাধ্যমে। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরপরই জিন্নাহ্ বলেছিলেন, সকল ধর্ম-গোষ্ঠীর জনগণ স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারবে এ পাকিস্তান রাষ্ট্রে।

পাকিস্তানকে একটা 'সেক্যুলার রাষ্ট্র' হিসেবেই নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জাতীয়তাবাদের বড় নিয়ামক যে ভাষা, তা কেবল ধর্মীয় চৈতন্য দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয় — এ বোধ তাঁকে বিশেষভাবে তাড়িত করেছিল। এবং এ শঙ্কা থেকেই ১৯৪৮ সালে পূর্ব-বাংলায় এসে যখন উর্দুকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলেন, তখনই প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। দেশের নানা জায়গা থেকেই এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আগেই এর প্রতিবাদ করেন। জানান কেন এবং কী কারণে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাতিল করে দেওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টি তিনি দৈশিক-বৈশ্বিক ভাষা-রাজনীতির পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ২৯ জুলাই *দৈনিক আজাদে* 'পূর্ব-বাংলার ভাষা সমস্যা' বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে বলেন, 'But let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language.' (ফজলুল ও মাহবুব, ২০২০: ৫১) এ বক্তব্যের পূর্বেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন:

> ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার পক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতিবিগর্হিত বটে। (আবুল কাসেম ও এ আর, ২০২০: ১৫)

পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের যে উদ্গম সে সময় হয়েছিল, তা থেকে মুক্তি পেতে নয়, বরঞ্চ সবাই সেই গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে বেশি আগ্রহী হয়েছিল। সমগ্র পূর্ব-বাংলার কোথাও প্রতিবাদ শোনা গেল না, এ পাকিস্তানপন্থি সাহিত্যান্দোলনের বিরুদ্ধে। নানারকম পত্র-পত্রিকা বের হতে থাকল; এবং সে-সব পত্র-পত্রিকার লেখা সমানভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্য — মূলত তা পুথি, ধর্মীয় চৈতন্য ও আধ্যাত্মিকতা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। এবং সে সময় যে ধারার পুথি সাহিত্যের ব্যবহার হচ্ছিল, তার সাথে বাংলা অঞ্চলের পুথি সাহিত্যের তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। আর বিশেষভাবে বলতে গেলে, পূর্ব-বাংলার সাধারণ জনগণের লোকমুখে প্রচলিত এবং সংগৃহীত পুথি এ-পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক দরকারে ব্যবহার করা হয়নি। এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে একেবারেই বিজাতীয় পুথি-পত্র। যার সাথে এ অঞ্চলের লোকজনের কোনো সম্পর্ক নেই।

নতুন কবিতা (১৯৪৯) ও *পূর্ব-বাংলার কবিতা* (১৯৫১) নামে যে কবিতার সংকলন ছাপা হয়, তার মধ্যেও এক গভীর ভারাক্রান্ত এবং নষ্ট জাতীয়তার বিষ ও বীজমন্ত্র সক্রিয় ছিল; তার দ্বারা সংক্রমিতও হয়েছিল এক অংশের সাহিত্যিকদের একটা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী। কিন্তু সবাই যে এ-ধারায় পথ হেঁটেছেন, তাও

সর্বাংশে সত্য নয়। এ প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিক গোষ্ঠীর বাইরে আরো একটা উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী গোষ্ঠী সাহিত্য রচনা করেছে। এ ধারায় হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) নাম প্রথমেই নেওয়া যেতে পারে। তিনি নিজেও ধর্মীয় চৈতন্যের ব্যাপারে সজাগ ছিলেন, এবং এর বিপরীতে গিয়ে তাঁর লেখা জারি রেখেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ছিল *একুশে ফেব্রুয়ারী* নামের সংকলন। সাংস্কৃতিক রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি বৃহৎ ঘটনা।

'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। *একুশে ফেব্রুয়ারী* সেই আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দলিল, যার প্রধান কাণ্ডারি হাসান হাফিজুর রহমান।' (রাফাত, ২০১৫: ২২২) হাসান হাফিজুর রহমান ভাষা আন্দোলন নিয়ে যে *একুশের সংকলন* করলেন, এবং সে-সংকলনে যাঁরা লিখলেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র। বিশেষভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ততা আছে, এমন লেখকরাই লিখেছিলেন সেদিন এ সংকলনে। তাঁর সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ততায় বিশেষ হয়ে ওঠে বাংলা বিভাগ। আর যেহেতু বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অঙ্গসংগঠন, ফলে একে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলাই যায়। হাসান হাফিজুর রহমানকে টেনে আনার একমাত্র কারণ এই যে, রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যে আন্দোলন, শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির মাধ্যমে গড় জনগণের মানস-জগতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এ-সংকলন কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ, জাতীয়তাবাদ যে সাংস্কৃতিকভাবে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, সে ব্যাপারটা আরো একটু উস্‌কে দেওয়ার কাজ করেছে এ-সংকলন। যা পরবর্তীকালে অগ্নিকণা থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছে।

নানা কারণে বাংলাদেশে ষাটের দশক গুরুত্বপূর্ণ — তা শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি — যে বিষয়েই কথা বলা হোক না কেন। কেউ কেউ একটা বিষয় নিয়ে মত-পার্থক্য দেখাতে পারেন যে, অর্থনৈতিক অবস্থা তো সে সময় ভালো ছিল না। কিন্তু এসময়ে দুই পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে যে অর্থনৈতিক চিন্তার প্রসার ঘটেছিল, তা তো নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য পূর্ব-বাংলায় অর্থনৈতিক-কাঠামো কেমন হবে, সে বিষয়ও সে-সময় নির্ধারণ করে ফেলেছিলেন অর্থনীতিবিদরা (Rehman, 2016 : 3-7)। তবে ষাটের এ সব বিষয় যে প্রপঞ্চকে ঘিরে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল, তা হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এসব বিষয়, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে বাঙালি জন-মানসে যে নতুন চিন্তার উদয় হলো, সে চিন্তার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল জাতীয়তাবাদের ব্যাপারটাই।

কিন্তু ভাষা আন্দোলনের ফলে যে পরিবর্তনটা হয়ে গেছে, সেটার পেছনে এ চৈতন্যগত পরিবর্তনই বড়ো ভূমিকা পালন করেছে। এরই জন্য অন্যান্য কাঠামোর পরিবর্তন কিংবা স্বাধীনতা বিষয়ে সচেতন-চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। আর এ

নবোদ্ভিন্ন চৈতন্যের পেছনে সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনা। যার মূল খোরাক আর অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-প্রভাব।

কিন্তু এ বিষয়ে বুঝতে বেশি সময় লাগেনি পাকিস্তানি সরকারের, তা বাংলা ভাষা আর সাহিত্যের ওপর অবরোধ সৃষ্টির দিকে নজর দিলেই স্পষ্ট হয়। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের মূল ক্ষমতা-কেন্দ্রে জায়গা না পাওয়ার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ এ ক্ষেত্রে। মনে রাখা জরুরি যে, দিনে দিনে এ বিষয়সমূহ জনগণের এক গভীর অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, যারা ছিল ক্ষমতা-কেন্দ্রের মূলে, এ ব্যাপারে ছিল গভীরভাবে সতর্ক। এবং এ বিষয়ে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর বাংলা বিভাগ বিশেষভাবে নিয়মিত প্রণোদনা যুগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশই — তা ভালো করেই উপলব্ধি করেছে পাকিস্তান সরকার। ফলে তারা চাচ্ছিল, যেন এ চৈতন্যগত জায়গায় যে জোয়ার উঠেছে, তা থামিয়ে দেওয়া যায়। দ্বিজাতিতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন-সূত্র হিসেবে কাজ করেছিল ধর্মীয় চৈতন্যের বিষয়টি। ফলে এ বিষয়কে ছাপিয়ে যখন শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চৈতন্য বড় হয়ে উঠছিল, তখন সেটি হয়ে যাচ্ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের টিকে থাকার জন্য শঙ্কাজনক। আর বারবারই পাকিস্তান তার দুই অঞ্চলের মধ্যকার সাংস্কৃতিক পার্থক্য মুছে ফেলে ধর্মীয় পরিচয়কে বড় করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তা তো নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় না। তাছাড়া জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের হিসাব-নিকাশের বেলায়ও তা অকেজো বিষয়।

কেবল কেন্দ্র ঢাকা নয়, এর বাইরেও অবদান রেখেছিল বাংলা বিভাগ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে আলোড়িত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। কার্যত দৃশ্যমান আন্দোলনে যেমন বাংলা বিভাগ এবং এ বিভাগের শিক্ষক-ছাত্ররা সম্পৃক্ত হয়েছিলেন, তেমনি করে চেতনা এবং বোধগত যে ব্যাপার, তাতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বাংলা বিভাগের। ভাষার যে একটা আলাদা ক্ষমতা আছে, ভাষা যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নানা কার্য-কারণের সূত্রের সাথে সম্পৃক্ত থাকে — জর্জ অরওয়েল (১৯০৩-১৯৫০) তাঁর ভাষা বিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Politics and the English Language'-এ তা বলেছেন (1950: 73)। অরওয়েলের এ ভাষা ও রাষ্ট্র বিষয়ক সিদ্ধান্ত কতটুকু ইংল্যান্ডে সম্পাদিত হয়েছিল তা বলা যায় না; তবে তাঁর এ ভাষাগত সিদ্ধান্ত গভীরভাবে সম্পৃক্ততা বজায় থাকতে সক্ষম হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাষা-প্রভাব বিষয়ে।

৩.

বাংলা ভাষার এ ক্ষমতায়, প্রভাবে এবং সম্পৃক্ততায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হলো, সে আন্দোলন কেবল ঢাকা এবং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেই সীমাবদ্ধ থাকল না; তা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ল দেশের নানা অঞ্চলে। এর পেছনেও রয়েছে নানা কারণ। ১৯২১ সালের পূর্বে পূর্ব-বাংলায় উচ্চশিক্ষার্থে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয়নি। বাংলা ভাগ আর বাঙালি মুসলমানের নানা দাবি-দাওয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলা বিভাগ। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানাভাবে পূর্ব-বাংলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বাংলা বিভাগ। এ অঞ্চলে সংঘটিত যে কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে বাংলা বিভাগ।

ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের তুঙ্গ পর্যায়েও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বাংলা বিভাগ। বিশেষ করে ১৩৭০ বঙ্গাব্দে বাংলা বিভাগ আয়োজিত ও অনুষ্ঠিত *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ*-১৩৭০ ছিল এর ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেতনাগত অনুঘটক হিসেবে। এ অনুষ্ঠানের ব্যাপ্তিকাল ছিল সাতদিন: ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ পর্যন্ত। নানাবিধ অনুষ্ঠানমালা ও প্রদর্শনী অসামান্য সাফল্য লাভ করে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উপস্থাপিত বক্তব্যের একটি সংকলন প্রকাশ, যা প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা বিভাগ থেকে ওই বছরই। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, এবং সহকারী সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এ সংকলনে সংযোজিত হয়েছে সভাপতি হিসেবে আবদুল হাইয়ের ভাষণ। এবং বাংলা ভাষার তিন যুগের সাহিত্য নিয়ে তিনজন বক্তা যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন, তাও সংকলিত হয়েছে এ সংকলনে। এ অনুষ্ঠানে উপাচার্যের উদ্বোধনী ভাষণের পর আবদুল হাই যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ভাষাকে গুরুত্ব প্রদানকারী জাতীয়তাবাদী চিন্তা এবং শিক্ষার প্রকৃত কাজ সম্পর্কে তিনি যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তা আজও প্রাসঙ্গিক।

৩.১

দেশ-কালের সমস্যা-নিরপেক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধারণা, এবং এ ধারণার সম্পাদনে যে সমস্যা হয় — তা থেকে মুক্তি-কামনার চিন্তা আবদুল হাইয়ের এ ভাষণে ছিল; এবং এ চিন্তা ছিল একেবারেই শেকড়ায়িত। শেকড়ের যে টান, তার সাথে একটা বিশেষ সংযোগ স্থাপনের ব্যাপার — তাও স্পষ্ট হয় আবদুল হাইয়ের ভাষণে। আবদুল হাইয়ের চিন্তা ছিল অনেকটাই আধুনিকতাস্পর্শী। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণায় এবং ধরনে যে পার্থক্য বর্তমান সময়ে স্পষ্ট হয়েছে, সে বিষয় ষাটের দশকেই আবদুল হাই চিন্তা করেছিলেন। বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর ভিত্তিতে ভারতবর্ষে ইংরেজরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচ তৈরি করেছিল, তা অনেকটাই উপনিবেশের সাথে সম্পৃক্ত।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জনের প্রস্তাবিত ঢাকায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের নীতির সাথে মেলালে, তা ইউরোপের মধ্যযুগের পরীক্ষাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়কে স্পষ্ট করে। কিন্তু আধুনিক সময়ের গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৪ সালের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও স্পষ্ট হয় না। বস্তুত তা ছিল কেবল পরীক্ষাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের। অর্থাৎ ইংরেজ আমলে, সিপাহি বিদ্রোহের পর পর, যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের। 'লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। পরীক্ষা নেয়ার অধিকার ছিল এই প্রতিষ্ঠানের।' (সৈয়দ নিজার, ২০১৮: ৪৫)

এ ধারণার বাইরে গিয়ে নতুন চিন্তা সন্নিবেশিত হয়েছিল আবদুল হাইয়ের ভাষণে। বিশেষ করে গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা, এবং সমাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নানা কাজে উদ্যমী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরিখের চিন্তা আবদুল হাইয়ের এ ভাষণে স্পষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমানে এসে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যে ধরনের সমস্যার ভেতরে আবদ্ধ হচ্ছে, সে অবস্থা বহু পূর্বেই আবদুল হাই বুঝতে পেরেছিলেন, এবং সে-বিষয়ে নিজের চিন্তা দ্বারা একরকম সমাধান দেওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার সাথে পূর্ব-বাংলার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন আবদুল হাই। তাঁর মতে, প্রকৃত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার সাথে একটা বৃহৎ সম্পর্ক রয়েছে পূর্ব-বাংলার। কারণ, তাঁর মতে, 'সেন রাজাদের সময়ে গৌড়কে কেন্দ্র করে যখন ব্রাহ্মণ্যবাদের বাহন সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন সংঘটিত হচ্ছিল, সে সময়ে নদীনালাপরিবৃত পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লালন ও চর্চা করেছে।' (মুহম্মদ আবদুল ২০২০: ৩৮-৩৯) এ বিষয়ে হুমায়ুন কবিরের মতও একসূত্রে মিলিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। হুমায়ুন কবিরের মতেও বাংলা ভাষা ও সাহিতর চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে পূর্ব-বাংলা (হুমায়ুন, ২০১৫: ৪-৫)। এস. ওয়াজেদ আলিও এ মতের সাথে একমত পোষণ করেছিলেন বহু আগেই (এস. ওয়াজেদ, ১৯৮৫ : ৬)। এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা বিভাগ হিসেবে চালু না হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের সাথে পাঠ শুরু হয় বাংলা বিষয়ের; তা ১৯২১ সাল থেকেই। এরপর ১৯৩৭ সালে সংস্কৃত থেকে আলাদা হয়ে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ততদিনেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বাংলা বিভাগ চালু হয়নি; চালু হয়েছিল বাংলা বিভাগ ১৯৪৩ সালে। (মুহম্মদ আবদুল ২০২০: ৩৯) ফলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা সাহিত্য ও ভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও এগিয়ে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — একথা তিনি বেশ গর্বের সাথেই উদ্ধৃত করেছিলেন।

এরপর দেশভাগ ও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৩ সালে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের দাবির ভিত্তিতে ৬ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল (সাইফুদ্দীন, ২০১৩)। এ নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ যাঁদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল, তাঁরা প্রত্যেক্যেই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং শিক্ষক। চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। যাঁরা ভাষা আন্দোলনে নানাভাবে সক্রিয় ছিল। এঁরাই নতুন বিভাগের হাল ধরেছিলেন; এবং ষাটের তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাংস্কৃতিকভাবে সামিল হয়েছিলেন। ভূমিকা রেখেছিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধেও, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।

এমনকি সে সময় সারা দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে-সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলন সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন, তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত। ফলে কেন্দ্রকে ঘিরে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, তার সাথে প্রান্তেরও একটা গভীর সম্পর্ক ছিল; সে সম্পৃক্ততার আবার একটা বড় অংশ ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত। আবদুল হাই সে সময় কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিয়েছিলেন। কারণ, তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এ দুটোই ছিল। এ ধারা এখনও পর্যন্ত সক্রিয় আছে। বাংলাদেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নানান প্রতিষ্ঠানে মেধা, নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা। আর এ ধারার সাথে বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবেও বাংলা বিভাগ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

আবদুল হাই তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার যাবতীয় উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানের ভার বিধাতা এ দেশের মানুষের হাতেই তুলে দিয়েছেন।' (মুহম্মদ আবদুল ২০২০: ৩৯) কাঠামোগত ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবেই আবদুল হাই বাংলা ভাষাবিজ্ঞান-চর্চা-অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু তিনি যে সময়ের সাথে সাথে বদলে ফেলেছিলেন নিজেকে, সংযুক্ত হয়েছিলেন সমাজ-ভাষাতত্ত্ব-চিন্তার সাথে — তা তাঁর এ উচ্চারণেই স্পষ্ট হয়। এ কথাই তাঁর মৃত্যুর পর স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমেই বাঙালি প্রমাণ করেছিল। মহৎ ব্যক্তিরা যে দূরদর্শী হন, আবদুল হাইয়ের কথা তা প্রমাণ করে। সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ যে একসূত্রে গ্রথিত ছিল, এবং তা থেকেই যে স্বাধীনতা অর্জন করবে বাঙালি, তা তিনি পূর্বোক্ত উক্তিতেই স্পষ্ট করেছিলেন।

এছাড়া আবদুল হাই তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন বাংলা বিভাগের দীর্ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্য। বাংলা বিভাগকে গবেষণাকেন্দ্রিক বিভাগ হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ বিষয় নানা উদাহরণে স্পষ্ট করে তোলেন। এর মধ্যে নানা কারণে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ

সাহিত্য পত্রিকা; যা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৪ (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গাব্দে। কিন্তু ১৩৭০ বঙ্গাব্দে (১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ) যে সময় এ ভাষণ তিনি দিচ্ছেন, তখন, ঠিক নিয়মমাফিক এ পত্রিকার ১২টি সংখ্যা বের হয়ে গেছে। এবং নতুন দুটো সংখ্যা প্রেসে। (মুহম্মদ আবদুল ২০২০: ৪২) ফলে গবেষণাকেন্দ্রিকতায়ও নিষ্ঠার সাথে ব্যাপৃত ছিলেন আবদুল হাই; তবে তা অবশ্যই বাংলা বিভাগে তাঁর সহকর্মীদের সাথে নিয়ে। এছাড়া বাংলা বিভাগের অধীনে ততদিনে প্রকাশিত হয়ে গেছে ১০টি বই। (আবদুল হাই, ২০২০: ৪২-৪৩)

আবদুল হাই এ ভাষণে কেবল বর্তমান ও অতীত নিয়েই আলোচনা করেননি। একইসাথে তিনি ভবিষ্যৎ বিষয়ে সুগভীর চিন্তার ফলাফল তুলে ধরেছেন। যা এ ভাষণের উপ-শিরোনাম হিসেবে ছিল: 'আমাদের কর্মসূচি' এবং 'আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য'। যার বাস্তবায়ন যদিও হয়নি। কিন্তু নানা কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন যেন তাঁর চিন্তার মধ্যেই ঘুরপাক খায়। এতই দূরদর্শী ছিল সে চিন্তা যে, ভাবলে বিস্ময় জাগে।

বিশেষ করে বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও শিক্ষাসহ জাতীয় পর্যায়ে তার সক্রিয় ব্যবহারের ব্যাপারে এক চমৎকার পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়েছে আবদুল হাইয়ের চিন্তায়। ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে পূর্ব-বাংলায় সর্বত্র বাংলা ভাষার ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য তাঁর 'আমাদের কর্মসূচি' এবং 'আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য' অংশে তাঁর যে চিন্তা-ছক (মুহম্মদ আবদুল ২০২০: ৪৭) — তা এখনও, স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স পঞ্চাশ পার হলেও — নানা কারণে গুরুত্বের দাবিদার। বিশেষ করে সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার সুনিশ্চিত করার জন্য। এছাড়া একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ভাষাও যে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক, তা তাঁর এ ভাষণে স্পষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বলছেন:

> অথচ একথা কে না জানে যে দেশের শিক্ষিত লোকেরা নিজেদের মাতৃভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল না হলে শিল্প-বিপ্লব ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও আত্মিক কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় না এবং জাতিপুঞ্জে সে দেশ চিরস্থায়ী মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে না। (মুহম্মদ আবদুল ২০২০: ৪৬)

শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের একটা দায় ও ভূমিকা রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতি। এ দায় ও ভূমিকা পালন করা জরুরি বিষয়। কেবলই জ্ঞানার্জন এবং তা বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বুদ্ধিজীবীর দায় কিংবা ভূমিকা হতে পারে না। নির্দিষ্ট রাষ্ট্রে, যে রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবী অবস্থান করছেন, সাধারণ জনগণের নানারকম দাবি-দাওয়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারার মাধ্যমে এ কাজটা একজন বুদ্ধিজীবী করে থাকেন। এ বিষয়টা এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদও সমর্থন করেছেন —

> প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ও নিষ্ঠুরতার মধ্যেও ঝুঁকি নেবে। ব্যবহারিক বিষয় থেকে দূরে থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী বিষয়কে চিহ্নিত করবে। আর সেই কারণে তাঁরা সংখ্যায় অনেক হতে পারে না, কিংবা নিয়মিতভাবে তাঁদের বিকাশও ঘটে না। তাঁদেরকে আপোষহীন ব্যক্তি হতে হবে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব হবে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। সর্বোপরি তাঁরা বর্তমান সামাজিক মর্যাদার বিরোধী হবে। (এডওয়ার্ড, ২০০৯: ২২)

আবদুল হাই বুদ্ধিজীবীর প্রকৃত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওপরে বর্ণিত সকল শর্তই পালন করেছিলেন। বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভূত পরিমাণে প্রচার ও প্রচারণার মাধ্যমে তা জনসাধারণের মাঝে সংক্রমিত করার দায়ভার নানান সময়ে আবদুল হাই তাঁর সহকর্মীদের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। এরই ফলে বুদ্ধিজীবীর যে দায় এবং ভূমিকা একটা রাষ্ট্রের জন্য — তা পালন করেছিলেন আবদুল হাই। *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহে*র সভাপতির ভাষণের মধ্যেও তা স্পষ্ট হয়।

৩.২

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহে* পঠিত তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল: 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্য'। এ প্রবন্ধ-পাঠের সূচনাতেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য বর্ণনা দিয়েছেন। বর্ণনা করেছিলেন বাংলা বিভাগের পাঠক্রম নির্ধারণ ও বাংলা বিভাগের পাঠদানে নিয়োজিত পণ্ডিতজনদের সম্পর্কে। বিশেষ করে নতুন প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে বাংলা পড়ানোর জন্য যে আগ্রহ ও সাহসের দরকার ছিল, তা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ছিল। এমনকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাংলা পড়াবে কে'-এর মতো সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ প্রশ্ন-বাক্যেও টলেননি শহীদুল্লাহ্। নিজেই বাংলা পড়াবেন, তা এ সংশয় দূরীভূত করার জন্য যথেষ্ট ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়। এবং তিনি তা করেও দেখিয়েছিলেন। পড়িয়েছিলেন বাংলা সাহিত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বাংলা বিভাগে।

এসব তো ইতিহাস, যা বলা হলো এতক্ষণ। কিন্তু যে প্রবন্ধ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পাঠ করেছিলেন, তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া গেলে এ প্রবন্ধ-পাঠের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সুবিধা হবে। যে কোনো ভাষার প্রাচীন সাহিত্য-রূপ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ওই নির্দিষ্ট ভাষার উদ্ভব-বিকাশের ইতিহাস ভাষাতাত্ত্বিকভাবে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি করে গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রেও। উনিশ শতকে উইলিয়াম জোন্স এশীয় ভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভবের সূত্র হিসেবে সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র ধরেছিলেন। কিন্তু উইলিয়াম জোন্সের যুক্তিকে মান্য না করারও নানান কারণ রয়েছে। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হলো:

> আমাদের চাষার মেয়েরাও কার্যের স্থানে কায্যি বলে। বিদ্যুতের স্থলে বিজ্জুলিও বলি না, বিজুলিও বলি না। চাষার মেয়েরাও বিদ্যুৎ বলে। অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃতের অনুনগামী। অতএব বিচার করা আবশ্যক – প্রথম, বাঙ্গালার অনার্য্য ভাষা কি ছিল? দ্বিতীয়, কি প্রকারে তাহা সংস্কৃতমূলক ভাষার দ্বারা কত দূর স্থানচ্যুত হইল? তৃতীয়, সংস্কৃতমূলক যে ভাষা, তাহা একেবারে সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, না প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত? বোধ হয় খুঁজিয়া ইহাই পাইবে যে, কিয়দংশ সংস্কৃত হইতে প্রাপ্ত, কিয়দংশ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত। চতুর্থ, সেই সংস্কৃতমূলক ভাষার সঙ্গে অনার্য্য ভাষা কত দূর মিশ্রিত হইয়াছে। ঢেঁকি, কুলো ইত্যাদি শব্দ কোথা হইতে আসিল? পঞ্চম, ফারসী, আরবী, ইংরেজি কোন্ সময়ে কত দূর মিশিয়াছে? (বঙ্কিমচন্দ্র, ১৪২৩: ২৯৩)

বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস উনিশ শতকে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত হয়েছিল। সে মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত ভাষার ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে। বিশেষ করে উইলিয়াম জোন্স এক্ষেত্রে বড় ভূমিকাটি পালন করেছিলেন (হুমায়ুন আজাদ, ২০০৭: ১৫৬-১৫৭)। পরবর্তীকালে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে বহুল সমর্থিত হয় ভাষার 'বংশগত শ্রেণিকরণ' প্রক্রিয়া। স্বয়ং শহীদুল্লাহ্ এ মত মান্য করে বাংলা ভাষার বংশগত শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষার বংশলতিকা তৈরি করেছেন (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ২০১০: ১৬০)। কিন্তু বাস্তবে তো আর্যদের পূর্বে বাংলার মানুষের ভাষা একেবারেই ছিল না, এমনও নয়। তারা মূক ছিল — তা বলা তো জগৎ-সত্যের সাথে ভীষণভাবে আপত্তিকর। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পঠিত প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় এ ভাষাতাত্ত্বিক বিতর্কের সুরাহার বিষয়টা। বিশেষ করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ব্যাপারটাকে যেমন শহীদুল্লাহ্ খারিজ করে দেননি, তেমনি করে বাংলা ভাষার আর্য-পূর্ব ভাষা-বৈশিষ্ট্য ও ভাষা-সম্পদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দেশ-কাল-পাত্রের সমন্বিত প্রক্রিয়ায় যে বাংলা ভাষার নির্মাণ-প্রক্রিয়া পাল আমলে একটি সুগঠিত রূপ পেয়েছিল, এ বিষয়ে মতামত দেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (২০২০: ৪৯)। একই প্রক্রিয়ায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত চর্যাপদের ভাষা-ভূমির যুক্তি-রূপকে চ্যালেঞ্জ করেন। এবং এ বিষয়ে মত দেন যে, 'বাস্তবিকই এই ভাষা বাংলা বটে। তবে তিনি একে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা বলে মনে করেছিলেন। ভাষার প্রমাণে এ ভাষাকে বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীন ভাষা মনে করাই সঙ্গত।' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ২০২০: ৫১)

কেবল ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না এ আলোচনা। 'ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও বাংলার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের জন্যও বৌদ্ধগানের প্রয়োজনীয়তা আছে।' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ২০২০: ৫২) — তা শহীদুল্লাহ্র এ প্রবন্ধ-পাঠে স্পষ্ট হয়। এ কথা স্মর্তব্য যে, বাংলার প্রাচীন ইতিহাস নির্মাণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক কিংবা অনুঘটক হিসেবে রসদের যোগানদাতা ছিল চর্যাপদ, আবিষ্কৃত হওয়ার পরপরই। যদিও এর পূর্বে রচিত হয়েছে নানান ইতিহাসগ্রন্থ; তবে তার সবই ছিল

রাজনৈতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস। যেখানে মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। চর্যাপদেই প্রথম মানুষ পাওয়া গেল। পাওয়া গেল মানুষের দৈনন্দিন নানান কার্যাবলি। 'বস্তুত, সমাজবিন্যাসের ইতিহাসই প্রকৃত জনসাধারণের ইতিহাস।' (নীহাররঞ্জন, ১৪২৫: ৫০) শহীদুল্লাহ্ এ বিষয়টাও বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছিলেন তাঁর পঠিত প্রবন্ধে। এবং প্রবন্ধের শেষে সংযুক্ত করেছিলেন একটি লাইন: 'উপসংহারে আমি বলতে চাই প্রাচীন বাংলার পঠন-পাঠন প্রধানত ভাষাতত্ত্বের জন্য হলেও তাতে সামাজিক ইতিহাস ও রসতত্ত্বের স্থান মিলবে।' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ২০২০: ৫৪) এ সেশনে আলোচক হিসেবে ছিলেন সৈয়দ মুর্তাজা আলী এবং নীলিমা ইব্রাহিম।

৩.৩

এ অনুষ্ঠানে মধ্যযুগের সাহিত্য ও ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। মুহম্মদ এনামুল হক মধ্যযুগের যুগবিভাজন বিষয়ে বিশেষ কিছু সূত্রের বিষয়ে বলেছিলেন। প্রবন্ধ-পাঠের শুরুতেই তিনি জানান, 'এ-সাহিত্যের যুগ-নির্ণয় সমস্যাটাই এর পঠন ও পাঠের ব্যাপারে একটা জটিল সমস্যা।' (মুহম্মদ এনামুল, ২০২০: ৫৭) এ যুগবিভাজন বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা করেছিলেন এনামুল হক। সে বিষয় এখনও প্রাসঙ্গিক, কার্যত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে ও করছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণ করে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে। এছাড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে এনামুল হক দিঙ্‌নির্ণয় করেছিলেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাজনের সাথে ইউরোপীয় সাহিত্যের যুগবিভাজন-প্রক্রিয়াকে মিলিয়ে পড়েছিলেন। এবং এ দুই অঞ্চলের যুগ-নির্ণয় করতে গিয়ে কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, সে বিষয়ে বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এনামুল হক। বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে তুর্কি-যুগ (১২০০-১৩৫০) সম্পর্কে যে আলো-আঁধারি চিন্তা বিদ্যমান ছিল, সে চিন্তার একটা কার্যকারণ সূত্র নির্মাণ করেছিলেন তিনি। বিষয়টা এ প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এছাড়া সুলতানী যুগ (১৩৫১-১৫৭৫) এবং মোগলাই যুগের (১৫৭৬-১৭৫৭) সাহিত্য-ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেন এনামুল হক।

এ প্রবন্ধের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'পঠন ও পাঠন'। এ অংশে এনামুল হক আলোচনা করেছেন মধ্যযুগের সাহিত্য-পাঠের নানান কৌশল বিষয়ে, এবং সেই সাথে মধ্যযুগের সাহিত্যের গুরুত্ব নিয়ে। বিশেষ করে আধুনিককালে মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রতি যে ধরনের অনাগ্রহ — সে বিষয়েই দৃক্‌পাত করেছেন এনামুল হক। মধ্যযুগের সাহিত্য-পাঠের একটা নাতিদীর্ঘ কৌশলও উপস্থাপন করেছিলেন। এ প্রবন্ধ-পাঠ অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এবং আহমদ

শরীফ। সভাপতি ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ*-১৩৭০-এ যে তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ 'মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য' প্রবন্ধটি।

৩.৪

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ-১৩৭০-এ আধুনিক যুগ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২)। সৈয়দ আলী আহসান তখনকার হিসেবে আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে একজন প্রজ্ঞাবান পণ্ডিত ও সমালোচক। তাঁর মেধা-জ্ঞান-প্রজ্ঞার কোনো কমতি ছিল না। বিশেষ করে এ তিনটি বক্তৃতা — *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ*-১৩৭০-এ প্রদত্ত — ছিল কবিতা নিয়ে। কারণ সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে কবিতা দিয়েই কেবল তা সম্ভব। কারণ অন্য বিষয় নিয়ে — মানে কবিতা বাদে অন্যান্য সাহিত্য-রূপ — আলোচনা করতে গেলে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। কারণ, বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অস্তিত্ব খুঁজতে হয় কবিতার অস্তিত্বেই। গদ্য এবং গদ্যনির্ভর সাহিত্য উনিশ শতকের দান। ফলত, সৈয়দ আলী আহসান আলোচনা করেছিলেন 'আধুনিক' কবিতা বিষয়ে। বিশেষ করে যুগবিচারের বেলায় সৈয়দ আলী আহসান মান্য করেছিলেন এবং একইসাথে জোর দিয়েছিলেন সাহিত্যের বক্তব্য প্রকাশের পদ্ধতির দ্বারা (সৈয়দ আলী, ২০২০: ৭৫)।

সৈয়দ আলী আহসান মধ্যযুগের সাহিত্যের সাথে 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের যে পার্থক্য ও তুলনা করেছেন — তা তিনি করেছেন মধ্যযুগের সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে আধুনিক যুগের সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের তুলনার বিচারে। মধ্যযুগের কবিতায় শব্দ ব্যবহার বিষয়টা ছিল একেবারেই নির্দিষ্ট কিছু শব্দের মধ্যে প্রোথিত এবং সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক যুগের কবিতায় শব্দের যে বিচিত্রমুখী অর্থ — প্রকৃতপক্ষে এ বিচিত্রমুখী অর্থই প্রকাশ করে নতুন সুর ও স্বর। 'কবিতায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রশ্নটা প্রথমে আসে, তারপরে উচ্চারণগত ধ্বনির বিশিষ্টতা এবং অবশেষে শব্দের অর্থবহন করবার ক্ষমতা' (সৈয়দ আলী, ২০০১: ২০) — এ কথাগুলো তিনি আধুনিক কবিতায় শব্দ ব্যবহারের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে* গ্রন্থে। যে গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৭০ সালে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত আধুনিক কবিতা বিষয়ক বক্তব্যই তিনি পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে রূপদান করেছিলেন।

৪.

লিখিত বক্তব্য-পাঠ ব্যতীত আরো নানা বিষয় সংযুক্ত ছিল এ অনুষ্ঠানে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল প্রদর্শনী। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত

প্রদর্শনীর চারটি শাখা ছিল। ভাষার বিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, লিপির পরিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাস।' (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ২০০৬: ৭) এ প্রদর্শনী ছিল জমজমাট। কেবল ঢাকাকেন্দ্রিক নাগরিক সম্প্রদায়ই এ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ব্যাপারটা তেমন নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যোগদান করেছিলেন এ প্রদর্শনীতে। এবং একইসাথে এ প্রদর্শনীতে যোগদান করেছিলেন অনেক বিদেশিও। অনুষ্ঠানের স্বাক্ষর-খাতা তেমনটাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। (মুহম্মদ আবদুল ও অন্যান্য, ২০২০: ২৮-৩৩)

এ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছিল প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক যুগের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বিষয়াদি। বাংলা লিপির বিবর্তনের ছকটা যে দুর্দান্ত ও আকর্ষণীয় ছিল, সে বিষয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন। তাছাড়া বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিষয়েও বিশেষ প্রদর্শনী হয়েছিল। আর তাতে দর্শকের পরিমাণ হয়েছিল আশাতীত। আর এসবই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাথে সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক বিষয়াদি, যা উপস্থাপিত হয়েছিল উৎসবমুখর পরিবেশে। সাংস্কৃতিক উৎসবে উপস্থাপন করা হয়েছিল এমন সব বিষয়, যার সাথে বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক চৈতন্যের বিষয়-আশয় সম্পৃক্ত ছিল। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষার বিষয়সমূহ যে নানান কারণে দরকারি বিষয় হয়ে ওঠে, সেই বিষয়টা *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ* সম্পূর্ণ করেছিল।

৫.

সে সময় আকাশ-সংস্কৃতি কিংবা সোশ্যাল-মিডিয়ার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের* ফলে এ অনুষ্ঠানের নানা বিষয় প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল সে সময়কার বাংলা ও ইংরেজ দৈনিক পত্রিকাগুলো। বলতে গেলে সে সময়কার সকল পত্রিকায়ই *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ* অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছিল। বিষয়টা ঢাকা শহরে অনুষ্ঠিত হলেও তা সমগ্র পূর্ব-বাংলার মানুষ জানতে পেরেছিল সংবাদপত্রের কল্যাণে। এ কারণে বাংলা বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানটি কেবল একটি নাগরিক এবং নাগরিক-মধ্যবিত্তের অনুষ্ঠান হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, তার উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছিল; এবং এ বিষয়টি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সে সময়কার পত্রিকাসমূহ।

ষাটের দশকে, বাংলা বিভাগ আয়োজিত এ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই যে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, ব্যাপারটা তেমন নয়। কিন্তু অনুষ্ঠানটি এ ধারার আন্দোলনে সাংস্কৃতিক রাজনীতির নিরিখে রেখেছিল

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পরবর্তীকালে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সপ্রাণ অংশগ্রহণই প্রমাণ দেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো বিভাগের সাথে তুলনায় ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ এবং বিভাগ পরিত্যাগের কারণে হুশিয়ারী-পত্র, বরখাস্ত-পত্র এবং আটক আদেশ জারি করে সে সময়ের সামরিক সরকার। যাঁদের ওপর এ আদেশ জারি করা হয় তাঁরা হলেন: অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম, ডক্টর মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেন (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ২০০৬: ৯-১২)। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ও আনোয়ার পাশা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শহীদ হন জাহাঙ্গীর মুনীর, নজরুল ইসলাম এবং মোস্তফা কামাল শাহরিয়ার। এছাড়া কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের সাথে থেকে নানাভাবে বিশ্বজনমত সংগ্রহে সচেষ্ট ছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সন্‌জীদা খাতুন, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ২০০৬: ১২)। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়েও বাংলা বিভাগ তার ইতিহাস-ঐতিহ্য সমুন্নত রেখে চলেছে। বিশেষ করে যে কোনো জাতীয় আন্দোলন সংগ্রামে সংযুক্ত থেকেছে বাংলা বিভাগ এবং এই ধারা এখনও সমানভাবে প্রবহমান।

৬.

বাংলা ভাষাকে ভিত্তি ও কেন্দ্র করে ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে এ আন্দোলন সম্পূর্ণতা পায়। এর পশ্চাতে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রেরণা-দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রচার এবং রক্ষার্থে এ বিভাগ, বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী নানাভাবে প্রথম থেকে আজ অবধি সমানভাবে সক্রিয় রয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যে কোনো সংকটে নানাভাবে সম্পৃক্ত হয়ে এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ। আর এরই ধারাবাহিকতায় *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ* ১৩৭০ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ ধারা শেষ হয়ে যায়নি। হয়েছে আরো সজীব; এখনও বাংলাদেশের শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভাষার প্রশ্নে প্রথমে, একবাক্যে, স্মরণ করা হয় বাংলা বিভাগকে। আর বাঙালি জাতীয়তাবাদী চিন্তা-প্রকল্পের অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও এ বাংলা বিভাগ।

টীকা

১. নয়া-উপনিবেশবাদ (Neo-Colonialism) শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ঘানার প্রথম প্রেসিডেন্ট কাওমে নক্রুমা (Kwame Nkrumah, 1909-1972)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে দীর্ঘ সংগ্রামের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত-কিন্তু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দিক থেকে একেবারেই অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং দুর্বল-এশিয়া ও আফ্রিকার এ দেশগুলো নিরাপত্তা ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য ঔপনিবেশিক শক্তির ওপর নির্ভর করে — এ প্রক্রিয়া আসলে ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশিত অঞ্চলের ভূখণ্ড ত্যাগের সময়ই রেখে যায় — এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদকে বলা হয় নয়া-উপনিবেশবাদ। আবার একে কেউ কেউ নয়া-সাম্রাজ্যবাদ হিসেবেও নির্দেশ করে থাকে। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য: Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin (2013). *Postcolonial Studies: The Key Concept* (Third Edition). Routledge, London, p. 177-178

২. ইউটোপিয়া (Utopia) একটি গ্রিক শব্দ — যার অর্থ কোথাও নেই (nowhere)। ইউটোপিয়ান রাষ্ট্র কেবল কল্পনার সত্য। বাস্তবে এমন রাষ্ট্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন টমাস মোর (১৪৭৮-১৫৩৫)। টমাস মোর ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড এবং ১৫১৬ সালে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তৎকালীন ইংল্যান্ডের নানা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তার নিন্দাজ্ঞাপন করেছেন প্রথম খণ্ডে। দ্বিতীয় খণ্ডে এক কাল্পনিক দ্বীপের কথা বলেছেন, যেখানে সবদিক থেকে ভালো সমাজ-ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য: টমাস মোর (১৯৮১)। *ইউটোপিয়া*, অনুবাদ: মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৭-২০

৩. বাংলা বিভক্ত হওয়ার অনেক আগে থেকেই পূর্ব-বাংলার জনগণকে 'বাঙাল' এবং পশ্চিম বাংলার জনগণকে 'ঘটি' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য: তপন রায় চৌধুরী, ২০১৯। *বাঙালনামা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সহায়কপঞ্জি

আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং এম আর মাহবুব, ২০২০। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

এস. ওয়াজেদ আলি, ১৯৮৫। *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী-প্রথম খণ্ড* (সম্পা. : সৈয়দ আকরম হোসেন), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ ও অন্যান্য (সম্পা.), ১৯৯৭। *বাংলাদেশের কবিতা*, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জী, ২০১৯। *বাঙলা ভাগ হল*, অনুবাদ: আবু জাফর, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

নীহাররঞ্জন রায়, ১৪২৫। *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

ফ্রাঞ্জ ফানো, ২০১৭। *জগতের লাঞ্ছিত* [*The Wretched of the Earth*-গ্রন্থের অনুবাদ], অনুবাদ: আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৪২৩। 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', *বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)* [সম্পা.: যোগেশচন্দ্র বাগল], সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

মুহম্মদ আবদুল হাই, ২০২০। 'ভাষণ', *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০* (সম্পা. : আবদুল হাই, আনিসুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম)। জাগৃতি প্রকাশনী (জাগৃতি প্রকাশনী-সংস্করণের সম্পাদক : আনিসুজ্জামান), ঢাকা।

মুহম্মদ এনামুল হক, ২০২০। 'মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য', *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০* (সম্পা.: আবদুল হাই, আনিসুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম)। জাগৃতি প্রকাশনী (জাগৃতি প্রকাশনী-সংস্করণের সম্পাদক : আনিসুজ্জামান), ঢাকা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ২০১০। *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

২০২০। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্য', *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০* (সম্পা. : আবদুল হাই, আনিসুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম)। জাগৃতি প্রকাশনী (জাগৃতি প্রকাশনী-সংস্করণের সম্পাদক : আনিসুজ্জামান), ঢাকা।

রাফাত আলম, ২০১৫। 'হাসান হাফিজুর রহমানের একুশে ফ্রেব্রুয়ারী', *সাহিত্য পত্রিকা* (সম্পা.: বিশ্বজিৎ ঘোষ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাইফুদ্দীন চৌধুরী, ২০১৩। '৬০ বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়', *প্রথম আলো* (সম্পা. : মতিউর রহমান), ৬ জুলাই, ঢাকা।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, ২০০৯। *রিপ্রেজেন্টেশনস্ অব দ্য ইন্টেলেকচুয়াল*, অনুবাদঃ দেবাশীষ কুমার কুণ্ডু, সংবেদ, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০১৫। *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান, ২০০১। *আধুনিক বাংলা কবিতা : শব্দের অনুষঙ্গে*, গতিধারা, ঢাকা।

২০২০। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০* (সম্পা.: আবদুল হাই, আনিসুজ্জামান ও রফিকুল ইসলাম)। জাগৃতি প্রকাশনী (জাগৃতি প্রকাশনী-সংস্করণের সম্পাদক : আনিসুজ্জামান), ঢাকা।

সৈয়দ নিজার, ২০১৮। *বিশ্ববিদ্যালয় : উদ্ভব, বিকাশ ও বিউপনিবেশায়ন*, প্রকৃতি-পরিচয়, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ, ২০০৭। *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন কবির, ২০১৫। *বাঙলার কাব্য*, বাংলা একাডেমি (সম্পা. : আনিসুজ্জামান), ঢাকা।

Rehman Sobhan, 2016. *From Two Economies to Two Nations: My Journey to Bangladesh*. Daily Star Books, Dhaka.

George Orwell, 1950. 'Politics and the English Language', *Shooting and Elephant and Other Essays*. Sacker and Warburg, London.

Romila Thapar, 2016. 'Reflections on Nationalism and History'. *On Nationalism* [Edited by Romila Thapar; Noorani, A. G.; Menon, Sadanand]. Aleph Book Company, New Delhi.